তাদেরকে আহবান করলে প্রথমত তারা শুনতেই পারবে না। কেননা মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয় এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্য সুপারিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয়---বিপক্ষেও নয়। সূরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا
يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۭ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۭ
وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾ وَلَا
الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاۗءُ
وَلَا الْاَمْوَاتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي
الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۭ
وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾
ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۣ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

(১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্‌র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্‌; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না---যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্‌র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। (২০) সমান নয় অন্ধকার ও আলো। (২১) সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্‌ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (২৫) তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতপর আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল আমার আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্‌র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্‌, তিনি (যে) অভাবমুক্ত, (এবং স্বয়ং) যাবতীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। (সুতরাং তোমাদের মুখাপেক্ষিতা দেখে তোমাদেরকে তওহীদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তোমরা তা না মানলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সত্তার দিক দিয়ে অভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তোমাদের অথবা তোমাদের কর্মের মুখাপেক্ষী নন। কাজেই তাঁর কোন ক্ষতির আশংকা নেই। কুফরের কারণে যে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ মুহূর্তেই তাও দূর করতে সক্ষম। সেমতে) তিনি ইচ্ছা করলে (কুফরের শাস্তিস্বরূপ) তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন, (যারা তোমাদের মত কুফর করবে না)। এটা আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়। (কিন্তু বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। মোটকথা, এখানকার অকল্যাণ কেবল সম্ভাবনারই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু কিয়ামতে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তখন অবস্থা দাঁড়াবে এই যে, কেউ অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। (নিজে তো কেউ কারও প্রতি লক্ষ্য করবেই না, এমন কি) যদি কেউ তার (পাপের) গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবানও করে তবুও কেউ তা বহন করবে না যদিও সে (অর্থাৎ আহূত ব্যক্তি আহবানকারীর) নিকটাত্মীয় হয়। [তখন কুফর ও মন্দকর্মের পূর্ণ ক্ষতি নিজেকেই ভোগ করতে হবে। এই তো গেল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন। অতপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের অস্বীকৃতি

দেখে দুঃখ ও পরিতাপ করবেন না। তারা একদিন এর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।] আপনি কেবল তাদেরকে (ফলপ্রসূ) সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। (অর্থাৎ মু'মিনগণ। আপনার সতর্কীকরণে তারাই উপকৃত হয় উপস্থিত ক্ষেত্রে অথবা ভবিষ্যতের দিক দিয়ে। উদ্দেশ্য এই যে, সত্যান্বেষী ব্যক্তিই লাভবান হয়। যারা সত্যান্বেষী নয়, তাদের কাছ থেকে উপকার আশা করবেন না। আপনি তাদের কুফরের কারণে এত দুঃখ করেন কেন,) যে ব্যক্তি (বিশ্বাস স্থাপন করে শিরক ও কুফর থেকে) নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের (উপকারের) জন্যই সংশোধন করে। (আর যে বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে পরকালে দুর্দশা ভোগ করবে। কেননা) আল্লাহ্‌র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন। (সুতরাং উপকার হলে তাদেরই হবে। আপনি কেন দুঃখ করেন? কাফিরদের জ্ঞান ও উপলব্ধি মু'মিনদের মত হোক, মু'মিনদের মত তারাও সত্য গ্রহণ করুক এবং সত্য গ্রহণের পারলৌকিক ফলাফলে তারাও শরীক হোক—তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা বৃথা। কেননা সত্য দর্শনে মু'মিনগণের দৃষ্টান্ত চক্ষুষ্মানদের ন্যায়, আর সত্য উপলব্ধি না করার ব্যাপারে কাফিরদের উদাহরণ অন্ধের ন্যায়। অনুরূপভাবে মু'মিনের অবলম্বিত পথের দৃষ্টান্ত আলোর ন্যায়; আর কাফিরের অবলম্বিত পথের দৃষ্টান্ত অন্ধকারের ন্যায়। যেমন, আল্লাহ্ বলেন: وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا মনিভাবে ঈমানের ফলস্বরূপ অর্জিত জান্নাত ইত্যাদির উদাহরণ সুশীতল ছায়ার মত এবং কুফরের ফলস্বরূপ অর্জিত জাহান্নাম প্রভৃতির উদাহরণ প্রখর রৌদ্রের ন্যায়; যেমন আল্লাহ্ বলেন, ظِلٍّ مَّمْدُودٍ -- فِي سَمُومٍ বলা বাহুল্য,) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, অন্ধকার ও আলো সমান নয় এবং ছায়া ও রৌদ্র সমান নয়। (কাজেই তাদের ও মু'মিনদের জ্ঞান ও উপলব্ধি সমান হবে না। এবং তাদের পথ ও ফলাফলও সমান হবে না। মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে তফাৎ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। সুতরাং তারা সমান নয় কথাটি এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে,) জীবিত ও মৃত সমান নয়। (তারা যখন মৃত, তখন মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ্‌র কাজ; বান্দার কাজ নয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়ত করলে তা ভিন্ন কথা। কেননা) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। (আপনার চেষ্টায় তারা সত্য গ্রহণ করবে না। কেননা তারা মৃতের মত। আর) আপনি কবরস্থদেরকে শোনাতে সক্ষম নন। (কিন্তু তারা না মানলে) আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা আপনি তো (কাফিরদের জন্য) কেবল সতর্ককারী। (তারা মেনেও নিক, এটা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার সতর্ক করা নিজের পক্ষ থেকে নয়, যেমন কাফিররা বলত; বরং আমার পক্ষ থেকে। কেননা) আমিই আপনাকে সত্যধর্মসহ

(মুসলমানদের জন্য) সুসংবাদ দাতা এবং (কাফিরদের জন্য) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (এ প্রেরণও কোন অভিনব বিষয় নয়, যেমন কাফিররা বলত। বরং) এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী হয়নি। তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তবে (আপনি কাফিরদের সাথে অতীত পয়গম্বরগণের ব্যাপার স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিন। কেননা) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সমসাময়িক পয়গম্বরগণের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছেও তাদের রসূলগণ স্পষ্ট মু'জিযা, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করেছিল। (অর্থাৎ কেউ সহীফা, কেউ বড় গ্রন্থ এবং কেউ শুধু নবুয়ত সত্যায়নের জন্য মু'জিযাসহ আগমন করেছিল। বিধিবিধান পূর্বেই পয়গম্বরগণ এনেছিলেন।) অতপর (তারা যখন মিথ্যারোপ করল, তখন) আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছি। (দেখ,) কিরূপ ছিল আমার আযাব ! (এমনিভাবে সময় এলে তাদেরকে শাস্তি দেব।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى – অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ – وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ

أَثْقَالَهُمْ ——অর্থাৎ যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে ; বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে। কিন্তু পথভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে——একটি পথভ্রষ্ট হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্য পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন——কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি

তোমার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মিনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে।

হযরত ইকরিমা বলেন, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ বাক্যের অর্থ তাই।

কোরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا — অর্থাৎ সেদিন কোন পিতা তার পুত্রকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং কোন পুত্র পিতাকে বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপভার নিজে বহন করে তাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ — অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে পালাতে থাকবে। পালানো অর্থ এই যে, সে আশংকা করবে, না জানি কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোন পুণ্য চেয়ে বসে। —(ইবনে কাসীর)

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ — এ আয়াতের শুরুতে কাফিরদেরকে মৃতদের সাথে এবং মু'মিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَن فِي الْقُبُورِ (কবরস্থ লোক)-এর অর্থ হবে কাফির। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফিরদেরও বোঝাতে পারবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো। নতুবা সাধারণভাবে কাফিরদেরকে সর্বদাই শোনানো হত। রসূলুল্লাহ্ (সা) যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মৃতদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। কারণ, তারা পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়—তেমনি কাফিরদেরকেও সৎপথে আনা সম্ভবপর নয়। এতে প্রমাণিত হল যে, আয়াতে "মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না" বলে ফলপ্রসূ শোনানো বোঝানো হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো সম্পর্কিত আলোচনার সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা

শুনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা রূম ও সূরা নমলে করা হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ
سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

(২৭) তুমি কি দেখনি আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতপর তদ্দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ—সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ; (২৮) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশীল ক্ষমাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি)! তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অতপর আমি পানি দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদ্গত করেছি (তা একই রকম হোক অথবা বিভিন্ন প্রকারের ফল বিভিন্ন বর্ণের।) পাহাড়সমূহেরও বিভিন্ন বর্ণের অংশ রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু সাদা, কিছু লাল (অতপর শুভ্র ও লোহিতেরও) বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে (কতক খুব শুভ্র ও খুব লাল, কতক হালকা শুভ্র ও হালকা লাল) এবং (কতক না শুভ্র না লাল; বরং) গভীর কাল। এমনিভাবে কতক মানুষ জীবজন্তু ও বিচিত্র বর্ণের চতুষ্পদ প্রাণীও রয়েছে। কখনও বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয় এবং কোন সময় একই প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয়। যারা কুদরতের দলীলাদি সম্পর্কে চিন্তা করে, তারা আল্লাহ্র মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং) আল্লাহ্ তা'আলাকে সে সব বান্দাই ভয় করে, যারা (তাঁর মহিমা সম্পর্কে) জ্ঞান রাখে। (জ্ঞান যদি কেবল বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসূত হয়, তবে ভয়ও বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসূত থাকবে। আর যদি জ্ঞান হালের স্তরে উন্নত হয়, তবে ভয়ও হালের থাকবে। ফলে এর অন্যথা দেখলে স্বভাবগত ঘৃণা ও কষ্ট হবে।) বাস্তবিকই আল্লাহ্ (-কে ভয় করা জরুরী। কেননা তিনি) পরাক্রমশালী (সবকিছু করতে সক্ষম এবং নিজের স্বার্থেই ভয় করা জরুরী। কেননা যারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদের গোনাহ্) ক্ষমাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তওহীদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গে---وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور---উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে বিষয়েরই বিশদ বিশ্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ব্যাপার। এ পার্থক্য উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল আকার ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয় ; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে।

ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ফলমূলের اختلاف الوان—তথা বর্ণ বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে مختلفا শব্দটিকে منصوب উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির اختلاف—তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে صفت--এর আকারে مختلف অর্থাৎ, مرفوع বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফলমূলের বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না—প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তুর বর্ণ সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جَادَّةٌ ও বলা হয়। কেউ কেউ جُدَّةٌ এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি---সাদা ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রণে গঠিত হয়।

كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا—অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে এখানে كَذٰلِكَ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে

ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, كَذٰلِكَ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ ফলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ্-ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে।---(রূহুল-মা'আনী)

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ এতে নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফির ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহ্গণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। انما শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলিম ও জ্ঞানিগণই আল্লাহ্কে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, انما শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ভীতি আলিমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলিম নয় তার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি না থাকা জরুরী হয় না।---(বাহরে-মুহীত, আবু হাইয়ান)

আয়াতে علماء বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহ্র দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলিম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র মারেফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র) বলেন, সে ব্যক্তিই আলিম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন,

ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بكثرة الخشية — অর্থাৎ অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইল্ম নয় বরং সে জ্ঞানই ইল্ম যা আল্লাহ্র ভয়সমৃদ্ধ।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহ্‌ভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলিম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ্ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না ; বরং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।---(ইবনে-কাসীর)

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (র) বলেন---এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি নেই, সে আলিম নয়।---(মাযহারী)

প্রাচীন মনীষিগণের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত রবী' ইবনে আনাস (রা) বলেন ঃ من لم يخش فليس بعا لم অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, সে আলিম নয়। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ انما العا لم من خشى الله ----অর্থাৎ কেবল সে-ই আলিম, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? তিনি বললেন, اتقا هم لربه. অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) ফকীহ্ ও আলিমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন ঃ

ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله و لم يرخص لهم فى معاصى الله تعا لى و لم يو منهم من عذاب الله تعا لى و لم يدع القران رغبة عنه الى غيره انه لاخير فى عبادة لا علم فيها و لا علم لافقه فيه و لا قراءة لا تد بر فيها -

অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ্ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গোনাহ্ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং কোরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোন কল্যাণ নেই, ফেকাহ্ ব্যতীত ইলমের কোন কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কোরআন পাঠ করার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। ---(কুরতুবী)

আল্লাহ্‌র ভয় নেই ; এমনও তো অনেক আলিম দেখা যায়---উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র কাছে কেবল আরবী জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলিম নয়। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলিমই নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত

ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা আলিমের জন্য জরুরী। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম—জরুরী নয়। —(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ
مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ
لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ ۖ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ
ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِىٓ
أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟
وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ
يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟
فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

(২৯) যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে,

যাতে কখনও লোকসান হবে না। (৩০) পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য---পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন। (৩২) অতপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা বলবে---সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৬) আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এ ভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩৭) সেখানে তারা আর্তচীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ্ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? অথচ তাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্র কিতাব (অর্থাৎ কোরআন কার্যকরভাবে) পাঠ করে এবং (বৈশিষ্ট্য ও নিয়মের সাথে) নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (যথাসম্ভব) ব্যয় করে, তারা (আল্লাহ্র ওয়াদার কারণে) এমন (চির লাভজনক) ব্যবসার আশা করে, যাতে কখনও মন্দা দেখা দেবে না। (কেননা, এ ব্যবসায়ের ক্রেতা কোন সৃষ্টজীব নয়; যারা এক সময় সওদার মূল্য দেয় এবং এক সময় দেয় না; বরং এর খরিদ্দার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি অবশ্যই ওয়াদা অনুযায়ী আত্মস্বার্থের প্রেক্ষিতে নয়, বরং তাদের উপকারার্থেই এর মূল্য দেবেন।) পরিণামে তাদেরকে তাদের (কর্মের) সওয়াবও পুরোপুরি দেবেন (যা অতপর جَنّٰتُ عَدْنٍ ---আয়াতে বর্ণিত হবে) এবং (সওয়াব ব্যতীত) স্বীয় অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। (উদাহরণত এক পুণ্যের দশগুণ বেশী সওয়াব দেবেন। যেমন

আল্লাহ্ বলেন---(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী। (ফলে তাদের কর্মে ত্রুটি থাকলেও প্রতিদানের অতিরিক্ত পুরস্কারও দেবেন। কোরআন পাকের আদেশ মেনে চলার কারণে তারা এই সওয়াব ও অনুগ্রহ পাবে। কেন-না,) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব (কোরআন) প্রত্যাদেশ করেছি, তা সম্পূর্ণ সত্য (এবং এ অর্থে) পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, (যে, সেগুলো মূলত আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, যদিও পরে বিকৃত হয়ে গেছে। মোটকথা, কোরআন সর্বতোভাবে পূর্ণ। যেহেতু) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের (অবস্থার) পূর্ণ খবর রাখেন (ও তাদের কল্যাণের প্রতি) নযর রাখেন। (তাই এ সময়ে এরূপ কিতাব নাযিল করাই প্রজ্ঞার পরিচায়ক ছিল। পূর্ণ কিতাব পালনকারী পূর্ণ প্রতিদানেরই যোগ্য। আসল সওয়াব ও অতিরিক্ত অনুগ্রহ হচ্ছে এই পূর্ণ প্রতিদান। সুতরাং এই সওয়াব ও অনুগ্রহ পৌঁছানোর জন্য আমি এ কিতাব প্রথমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি) অতপর সে কিতাব এমন সব লোকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছি যাদেরকে আমি আমার (সারা জাহানের) বান্দা-দের মধ্য থেকে (ঈমানের দিক দিয়ে) মনোনীত করেছি। (এর অর্থ মুসলিম সম্প্রদায়। তারা ঈমানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় যদিও তাদের কেউ কেউ কুকর্মের কারণে তিরস্কারযোগ্যও বটে। অর্থাৎ আমি মুসলমান-দেরকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) অতপর (এই মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তিনভাগে বিভক্ত---) তাদের কেউ তো (গোনাহ্ করে) নিজের প্রতি জুলুম করেছে, কেউ (গোনাহ্ও করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইবাদতও করে না) মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্র তওফীকে কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যায়। (অর্থাৎ গোনাহ্ থেকেও বেঁচে থাকে এবং ফরযের বাইরেও আমল করার হিম্মৎ করে। মোটকথা, আমি এই তিন রকম মুসলমানকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) এটা (অর্থাৎ এমন পূর্ণ কিতাবের অধিকারী করা আল্লাহ্র) মহা অনুগ্রহ। (কারণ, এই কিতাব আমল করার দৌলতে তারা অত্যধিক পুরস্কার ও সওয়াবের যোগ্য হবে। অতপর এই পুরস্কার ও সওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে,) তা (অর্থাৎ পুরস্কার ও সওয়াব) বসবাসের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। তথায় তারা স্বর্ণ নির্মিত ও মুক্তা খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা (সেখানে প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহ্র লাখ লাখ শোকর, যিনি (চিরতরে) আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে চিরকাল বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় আমাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করবে না। (এ হচ্ছে তাদের অবস্থা, যারা কিতাব মেনে চলে।) আর যারা (এর বিপরীতে) কাফির, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদেরকে মৃত্যুর ফয়সালা দেওয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে (এবং মরে মুক্তি পেয়ে যাবে) আর না তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে। আমি প্রত্যেক কাফিরকে এমনি

শাস্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে (অর্থাৎ জাহান্নামে পতিত অবস্থায়) আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করুন। (এখন) আমরা ভাল (ভাল) কাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা কবর না। (ইর-শাদ হবে,) আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি, যাতে যার বোঝার, সে বোঝতে পারতো? (কেবল বয়স দিয়েই শেষ করিনি ; বরং) তোমাদের কাছে (আমার পক্ষ থেকে) সতর্ককারী (পয়গম্বর) ও পৌঁছেছিল (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ; কিন্তু তোমরা কোন কথা শুননি) অতএব (এখন সেই না শোনার) স্বাদ আস্বাদন কর, (এমন) জালিমদের (এখানে) কোন সাহায্যকারী নেই। (আমি তো অসন্তুষ্টির কারণে সাহায্য করব না। অন্যরা অক্ষমতার কারণে সাহায্য করবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী এক আয়াতে আল্লাহ্ তত্ত্ব-জ্ঞানী হক্কানী আলিমগণের একটি বৈশিষ্ট্য —আল্লাহ্র প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তিলাওয়াতে-কোরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন তিলাওয়াত করে। مضارع পদবাচ্যে يَتْلُوْنَ ক্রিয়াপদটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকর্মে কোরআনের অনুশ্রবণ করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য। তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নির্দিষ্ট যে, সে তিলাওয়াত ধর্তব্য, যা কোরআন অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু তিলাওয়াত শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থেই ধর্তব্য হবে। হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, —هذه اية القراء অর্থাৎ এ আয়াতটি ক্বারীগণের জন্য যারা কোরআন তেলাওয়াতকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় গুণ নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরী হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাআতে নামায আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহ্র পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরী হয়ে যায়। নামায ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকাহ্বিদগণ বলেন, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামায ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরোক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতপর বলা হয়েছেঃ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ—تبور শব্দটি بوار থেকে উদ্ভূত। অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশংকা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মু'মিনের জন্য কোন সৎকাজে সওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিশ কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রাপ্য ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফিরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানী অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে يَرْجُونَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার কারও নেই---বেশীর চেয়ে বেশী আশাই করতে পারে।---(রূহুল-মা'আনী)

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথেঃ এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকে ব্যবসা বলা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে لَّن تَبُورَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মত কোন ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। 'তারা প্রার্থী'---একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত

সীমিত ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশি দান করবেন। বলা হয়েছে ঃ

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ—এখানে لِيُوَفِّيَهُمْ শব্দটি لَنْ تَبُورَ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত অনেক বেশি দেবেন।

এই বেশির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মু'মিনের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলা বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশির পক্ষে সাতশ গুণ বরং যা তার চেয়েও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'মিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মু'মিন তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।---(মাযহারী)

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্য হতে পারবে, কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا—ثُمَّ অব্যয়টি পূর্বাপর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্নগুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু আগে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়। অতপর এই আগপাছ কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়ে থাকে। এ আয়াতে ثُمَّ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত أَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عطف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতের জন্য অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্র কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গম্বর-

গণ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার স্বরূপ ইলম বা জ্ঞান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলিম ও জ্ঞানীগণকে পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরোক্ত অগ্র-পশ্চাৎ কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি। অতপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে। একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোন কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কোরআন পাকের এই ধনও মনোনীত বান্দাদেরকে কোন কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলিমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমান আলিমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতপর হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ

فظالمهم يغفر له و مقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا و سابقهم يدخل الجنة بغير حساب -

অর্থাৎ এ উম্মতের জালিমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।----(ইবনে কাসীর)

আয়াতের اَصْطَفَيْنَا শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বরহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে ঃ- اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ-

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে اصطفاء অর্থাৎ মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার ঃ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালিম, মধ্যপন্থী ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাসীর এই প্রকারত্রয়ের তফসীর এভাবে করেছেন ঃ জালিম সে ব্যক্তি যে কোন কোন ফরয ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থী সে ব্যক্তি যে সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু কোন কোন মোবাহ বিষয় ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।---(ইবনে কাসীর)

অন্যান্য তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। রূহুল মা'আনীতে তেতাল্লিশটি উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উক্তির সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ উল্লিখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, জালিমও আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যত অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اصطفينا গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে মুহাম্মদীর মু'মিন বান্দাদের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যত ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতের الذين اصطفينا- —তে বর্ণিত তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই স্তরভুক্ত এবং জান্নাতী।—(ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ মাগফিরাত সবারই হবে এবং সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

ইবনে জরীর আবূ সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি (আবূ সাবেত) মসজিদে পৌঁছে হযরত আবুদ্দারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পান। তিনি তাঁর বরাবরে গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেন ঃ اللهم انس وحشتى وارحم غربتى ويسرلى جليسا صالحا —অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমার আন্তরিক পেরেশানী দূর করুন, আমার প্রবাসী অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। (এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গ-গণের মধ্যে সৎসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারী বিষয় বলে গণ্য হত। তারা সৎসঙ্গীকে প্রধান লক্ষ্য ও যাবতীয় পেরেশানীর প্রতিকার মনে করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর জন্য দোয়া করতেন।) আবুদ্দারদা (রা) এই দোয়া শুনে বললেন, আপনি এ দোয়া ও অন্বেষণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার মত সৎসঙ্গী চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।) তিনি আরও বললেন, আমি আপন'কে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। যা আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ থেকে শুনেছি। এ পর্যন্ত কারও কাছে বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি। হাদীসটি এই ঃ রসূলে করীম (সা) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বলেছেন, এই তিন রকম লোকের মধ্যে সৎকর্মে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যপন্থীদের কাছ থেকে হালকা হিসাব নেওয়া হবে এবং জালিম এস্থলে খুব দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে তার দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ —অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।

তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, وكلهم من هذه الامة অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই হবে উম্মতে মুহাম্মদী থেকে।

আবূ দাউদ ওকবা ইবনে সাহবান হেনায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে এই আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—বৎস! এ

তিন প্রকার লোকই জান্নাতী। তাদের মধ্যে অগ্রগামী তারা, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যমানায় প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) দিয়েছেন। মিতাচারী বা মধ্যপন্থী তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ববর্তী-দের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতপর আমাদের ও তোমাদের মত লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি।

বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। নতুবা সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অগ্রগামীদের প্রথম সারির একজন।

ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এর জালিমও ক্ষমাপ্রাপ্ত। মিতাচারী জান্নাতী এবং সৎকাজে অগ্রগামী দল আল্লাহ্র কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের (রা) জালিমের তফসীরে বলেন ঃ الذى خلط عملا صالحا و اخر سيئا ---অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অসৎ উভয় কর্মে সংমিশ্রণ ঘটায় সে জালিম পর্যায়ভুক্ত।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র কিতাব ও রসূল (সা)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কিরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে العلماء ورثة الانبياء-এর সারমর্ম এই যে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ্ মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাবা ইবনে হাকাম (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আলিমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্য রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই করনা কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় নেই, সে আলিমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ্ ভীতির রঙে রঞ্জিত আলিমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসাবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুলত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফিরাত তোমাদের জন্য অবধারিত।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হাশরে আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে একত্র করবেন, অতপর আলিমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন ঃ

انى لم اضع علمى فيكم الا لعلى بكم و لم اضع علمى فيكم لاعذ بكم انطلقوا قد غفرت لكم

অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্য রেখেছিলাম যে, আমি জানতাম (ও যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে।) তোমাদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও; আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।---(মাযহারী)

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে সর্বপ্রথম জালিম, অতপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থী ও সর্বশেষে সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবত এই যে, জালিমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী-মধ্যপন্থী এবং আরও কম সৎকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

অর্থাৎ শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন ঃ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ অর্থাৎ এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোশাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্য শোভনীয় নয়। কেননা দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে।---(মাযহারী)

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।---(কুরতুবী)

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোশাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরি বরতনে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে।---(বুখারী, মুসলিম)

হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে; সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না। ---(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধানকারী পুরুষ পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। ---(মাযহারী)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ---অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃত পক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

در ریں دنیا کسے بے غم نباشد
وگر باشد بنی آدم نباشد

এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে কোন সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরই নিস্তার নেই। একারণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'দারুল-আহযান' দুঃখ-কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমত দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়ত কিয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়ত হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং চতুর্থত জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ-কষ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে ওঠার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ বলতে বলতে উঠছে।---(তিবরানী, মাযহারী)

উপরে বর্ণিত আবুদ্দারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত জালিম শ্রেণী-ভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, জালিম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও জালিম সকল শ্রেণীর জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদ হওয়া অবান্তর নয়।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মু'মিনের শান। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ও প্রধান প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাঁদের-কে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

اَلَّذِىْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ

আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। এক. জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। দুই. সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। তিন. সেখান কেউ ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে। জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোন কোন হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে। ---(মাযহারী)

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ——অর্থাৎ জাহান্নামে যখন কাফিররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ্ আঠার বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠার বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালমন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফিরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও

সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহ্র প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ্ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে বয়সে গোনাহ্গার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাসও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য কোন ওযর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠার বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওযর আপত্তি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে ঃ

اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین و اقلهم من یجوز ذلک

---অর্থাৎ আমার উম্মতের বয়সঅষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হবে। খুব কম লোকই এই সীমা অতিক্রম করবে।---(ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ---এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মত জ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্য মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। 'নযীর' শব্দের অর্থ ভীতি-প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে আপন লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ

ও তাঁদের নায়েব আলিমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্য আমি জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাফর বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত نذير (সতর্ককারীর) অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বলা-বাহুল্য, পয়গম্বর ও আলিমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে। এতে কোন বিরোধ নেই।

সত্য এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সত্তায় ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে।

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَلَا
يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۚ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

(৩৮) আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফিরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি

তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম রয়েছে, বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (এ হচ্ছে তাঁর জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা। কুদরত ও নিয়ামত উভয় বিষয় জ্ঞাপনকারী কর্মগত পরাকাষ্ঠা এই যে,) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করেছেন। (এসব অনুগ্রহের প্রেক্ষিতে তোমাদের উচিত ছিল তওহীদ ও আনুগত্য স্বীকার করা। কিন্তু কেউ কেউ এর বিপরীতে কুফর ও শত্রুতায় মেতে উঠেছে।) অতএব (এতে অন্যের কি ক্ষতি হবে, বরং) যে কুফর করবে, তার কুফরের শাস্তি তার উপরই পতিত হবে। (শাস্তি এই যে,) কাফিরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে (যা দুনিয়াতেই বাস্তবরূপ লাভ করে) এবং কাফিরদের কুফর (পরকালে) তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (এ ক্ষতি হচ্ছে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হওয়া। তারা যে কুফর ও শিরক করে যাচ্ছে,) আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা পূজা কর? তারা পৃথিবীর কোন অংশ সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও; না আকাশ সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে? (যাতে যুক্তির নিরীখে তাদের পূজার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়) না আমি কাফিরদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি? (যাতে শিরক বৈধ বলে লিখিত আছে) যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম আছে? (বস্তুত যুক্তিগত ও বর্ণনাগত কোন দলীলই নেই;) বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণা-মূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। (অর্থাৎ তাদের বড়রা ভিত্তিহীন মিথ্যা বলেছে هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ অথচ বাস্তবে তারা ক্ষমতাহীন। সুতরাং পূজার যোগ্য হতে পারে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিধায় তিনিই ইবাদতের যোগ্য। আল্লাহ্ যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তার প্রমাণাদির মধ্য থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে (স্বীয় কুদরতের দ্বারা) স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি (ধরে নেয়ার পর্যায়ে) এগুলো টলে যায়, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এগুলোকে স্থির রাখতে পারে না। (সৃজিত বিশ্বের হেফাযতও যখন তাদের দ্বারা হয় না, তখন বিশ্বকে সৃষ্টি করার আশা কিরূপে করা যায় এবং ইবাদতের যোগ্যই বা তারা কেমন করে হতে পারে? এতদসত্ত্বেও শিরক করার কারণে এ মুহূর্তেই শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু যেহেতু) তিনি সহনশীল,

(তাই অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। এই সুযোগে যদি তারা সৎপথে এসে যায়, তবে যেহেতু তিনি) ক্ষমাশীল (তাই অতীত সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ —خلائف শব্দটি خليفة-এর বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ —আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে ; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া।—اَنْ تَزُوْلَا শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল—এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى
الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِى
الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ
اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا
قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا

مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ
اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

(৪২) তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করলে তারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে চলবে। অতপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করল, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল। (৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। (৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলেও দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহ্‌কে অপারক করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৪৫) যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্‌র সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা [অর্থাৎ, কোরায়শ কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে] জোর শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করলে তারা যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হিদায়ত কবূল করবে (অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না)। অতপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)] আগমন করলেন, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল, পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং (ঘৃণাই শুধু বেড়ে যায়নি ; বরং তাদের) কুচক্রও (বেড়ে গেল। অর্থাৎ ঔদ্ধত্যের কারণে তাঁর অনুসরণে লজ্জাবোধ তো করতই ; উপরন্তু তাঁকে উৎপীড়নের চেষ্টায় লেগে গেল। তারা আমার রসূলের বিরুদ্ধে কুচক্র করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। কেন না), কুচক্রের (আসল) শাস্তি কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। (বাহ্যত প্রতিপক্ষেরও ক্ষতি হয়ে গেলে সে ক্ষতি হয় পার্থিব। কিন্তু ক্ষতি সাধনকারী পারলৌকিক শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। পারলৌকিক শাস্তির সামনে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ বিষয়। সুতরাং, এদিক দিয়ে 'কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে' কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য)। তারা (আপনার শত্রুতা ও উৎপীড়নে লেগে থেকে) কেবল পূর্ববর্তী (কাফির)-দের রীতিরই অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ আযাব

ও ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে।) অতএব (তাদের জন্যও তাই হবে। কেননা), আপনি আল্লাহ্‌র রীতিতে পরিবর্তন পাবেন না। (যে, তারা আযাবের পরিবর্তে কৃপা লাভ করতে থাকবে।) এবং—(এমনিভাবে) আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন নড়বড়ও পাবেন না (যে, তাদের পরিবর্তে অন্য ভাল লোকদের আযাব হতে থাকবে। অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা যে, কাফিরদের আযাব হবে—দুনিয়াতে অথবা কেবল আখিরাতে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সর্বদা সত্য হয়ে থাকে। সুতরাং আযাব না হওয়ার কিংবা তাদের স্থলে অন্য নিরপরাধদের আযাব হওয়ার আশংকা নেই। কুফর আযাবকে অনিবার্য করে না—তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত।) তারা কি পৃথিবীতে (অর্থাৎ শাম ও ইয়ামেনের সফরে আদ, সামূদ ও কওমে লূতের জনপদসমূহে) ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের (সর্বশেষ পরিণাম এই মিথ্যারোপের কারণে) কি হয়েছে। (তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে) অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। (যে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কিন্তু) আকাশ ও পৃথিবীতে কোন (শক্তিশালী) বস্তুই আল্লাহ্‌কে পরাজিত করতে পারে না। (কেননা,) তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান। (সুতরাং ইহাকে কিভাবে কার্যকর করতে হবে, জ্ঞানের মাধ্যমে তা তিনি জানেন; অতপর শক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারেন। অন্য কেউ এমন নয়। সুতরাং তাঁকে কে পরাজিত করতে পারে? আযাব আসে না দেখে যদি তারা তাদের শিরক ও কুফরকে সঠিক বলে মনে করে, তবে এটাও তাদের ভুল। কেননা, বিশেষ রহস্যবশত তাদের জন্য তাৎক্ষণিক আযাব ধার্য করা হয়নি। নতুবা) যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃত (কুফরী) কর্মের কারণে (তৎক্ষণাৎ) পাকড়াও করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না। (কারণ কাফিররা কুফরের কারণে ধ্বংস হয়ে যেত এবং স্বল্পতার কারণে মু'মিনগণকে দুনিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হত। কারণ বিশ্বব্যবস্থা বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সমষ্টির সাথে জড়িত। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির উপকার লাভ। মানবজাতি না থাকলে তারাও থাকত না।) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ (অর্থাৎ কিয়ামত) পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতপর যখন তাদের সে মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজেই দেখে নেবেন। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে শাস্তি দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا يُصِيبُ কিংবা لَا يُحِيطُ অর্থ لَا يَحِيقُ—وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

—অর্থাৎ কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না—কুচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা ধর্মীয় ক্ষতি। আর কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আযাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেনঃ তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এক---কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেওয়া, দুই---জুলুম করা এবং তিন---অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।---(ইবনে কাসীর)

বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات
با دردکشان هرکه در افتاد بر افتاد

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

سورة يس

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤
تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ
اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝١١ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝١٢

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) ইয়া-সীন, (২) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন, (৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ, (৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফিল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি ফলে তাদের মস্তক ঊর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। (১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক

করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু'য়েই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইয়াসীন---(এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন।) কসম প্রজ্ঞাময় কোর-আনের, নিশ্চয় আপনি পয়গম্বরগণের একজন (এবং) সরলপথে প্রতিষ্ঠিত। [এ পথে যে আপনাকে অনুসরণ করে, সে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কাফিররা বলে, لَسْتَ مُرْسَلًا (আপনি রসূল নন।) অথবা বলতো بَلِ افْتَرَاهُ (অর্থাৎ আপনি মনগড়া কথা বলেন)---এটা সত্য নয়। এর জন্য পথভ্রষ্ট হওয়া অপরিহার্য। কোরআন পরিপূর্ণ হিদায়েতকারী হওয়ার সাথে সাথে আপনার রিসালতের দলীলও বটে। কেননা] এ কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (এবং আপনাকে এজন্য পয়গম্বর করা হয়েছে,) যাতে আপনি (প্রথমে) এমন সব লোকদেরকে (আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করেন, যাদের পিতৃপুরুষদেরকেও (নিকটবর্তী কোন রসূলের মাধ্যমে) সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা বেখবর রয়ে গেছে। (পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তের কিছু বিষয় আরবে বর্ণিত ছিল। যেমন, أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ---আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন কি তাদের কাছে এমন বিষয় নিয়ে আগমন করেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের শ্রুতিগোচর হয়নি? অর্থাৎ তওহীদের দাওয়াত অভিনব নয়। এটা সর্বদা তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু এতদ-সত্ত্বেও কোন পয়গম্বরের আগমনে যতটুকু সাড়া জাগে, শুধু কোন কোন সংবাদ বর্ণিত হলেই ততটুকু সাড়া জাগে না; বিশেষত সে সংবাদ যদি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রথমে কোরায়শ গোত্রকে সতর্ক করেছিলেন। তাই এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে। অতপর সমগ্র মানব জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, তিনি সকলের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। আপনার বিশুদ্ধ রিসালত ও কোরআনের সত্যতা সত্ত্বেও যে আপনাকে মানে না, সেজন্য আপনি মোটেও দুঃখিত হবেন না। কেননা,) তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে। (সে বাণী এই যে, তারা সৎপথে আসবে না।) সুতরাং তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (তাদের অধিকাংশের অবস্থাই ছিল এমন। অবশ্য কারো কারো ভাগ্যে ঈমানও ছিল। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করেছিল। ঈমান থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে তাদের

অধিকাংশের অবস্থা যেন এরূপ যে,) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত (ভারী-ভারী) বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের সমস্ত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। (কাজেই মস্তক নিচে নামিয়ে পথ দেখতে পারে না। তাদের অবস্থা আরও যেন এরূপ যে,) আমি তাদের সামনে এক প্রাচীর এবং পেছনে এক প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর (চতুর্দিক থেকে) তাদেরকে (পর্দায়) আবৃত করে দিয়েছি। ফলে তারা (কোন কিছু) দেখতে পারে না। (উভয় উপমার সারমর্ম এই যে,) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে সমান। তারা (কোন অবস্থাতেই) বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (তাই আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে স্বস্তি লাভ করুন।) আপনি তো কেবল তাদেরকেই (কল্যাণকরভাবে) সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ মেনে চলে এবং আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে। (ভয় থেকেই সত্যান্বেষার সৃষ্টি হয় এবং সত্যান্বেষণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। অথচ তারা ভয় করে না।) অতএব (এমন লোককে) আপনি ক্ষমা ও (আনুগত্যের) মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিন। (এ থেকেই জানা গেল যে, পথভ্রষ্ট ও বিমুখ ব্যক্তি ক্ষমা ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত ও আযাবের যোগ্য হবে। অবশ্য দুনিয়াতে এই শাস্তি ও প্রতিদানের প্রকাশ জরুরী নয় ; কিন্তু) আমিই (একদিন) মৃতদেরকে জীবিত করব। (তখন সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।) এবং (যেসব কর্মের কারণে শাস্তি ও প্রতিদান হবে।) আমি (সেগুলো সর্বদা) লিপিবদ্ধ করি—সেকর্মও যা তারা সামনে প্রেরণ করে এবং সে কর্মও যা তারা পেছনে রেখে যায়। (مَا قَدَّمُوا বলে সে কাজই বোঝানো হয়েছে, যা তারা নিজেরা করে এবং آثَارَهُمْ বলে প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে, যা সে কাজের কারণে সৃষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। উদাহরণত এক ব্যক্তি একটি সৎকাজ করল, যা অপরের হিদায়েতেরও কারণ হয়ে গেল অথবা কেউ কোন মন্দ-কাজ করল, যা অপরেরও পথ ভ্রষ্টতার কারণ হয়ে গেল। মোটকথা, এগুলো সব লিখিত হয় এবং পরকালে এসবের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে।) আর (আমার জ্ঞান এত বিস্তৃত যে, এভাবে লিপিবদ্ধ করারও প্রয়োজন নেই, যা কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর করা হয়। কেননা) আমি প্রত্যেক বস্তু (যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে তা হওয়ার আগেই) এক স্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফূযে) সংরক্ষিত রেখেছি। তবে কোন কোন বিশেষ রহস্যবশত সংঘটিত ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই কোন কর্ম অস্বীকার করার অথবা গোপন রাখার অবকাশ নেই। শাস্তি অবশ্যই হবে। বিস্তারিত বিবরণের দিক দিয়ে লওহে মাহ্‌ফূযকে 'স্পষ্ট' বলা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, يس قلب القرآن অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন কোরআনের

হৃৎপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ্ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফিরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর।---(রূহুল মা'আনী, মাযহারী)

ইমাম গাযযালী (র) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃৎপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কিয়ামত ও হাশর-নশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকাল বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালভীতিই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রূহুল মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম 'আযীমা' ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সূরার নাম 'মুয়িম্মাহ্' বলে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম 'শরীফ' বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এর সুপারিশ 'রবীয়া' গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্য কবূল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'মুদাফিয়াও' বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'কাযিয়া'-ও উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়---(রূহুল মা'আনী)

হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়।---(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায়। ---(মাযহারী)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।---(মাযহারী)

يس।

يس---শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই বলা হয়েছে। আহকামুল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালিকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ 'হে মানুষ' আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবায়ের (রা)-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, 'ইয়াসীন' রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম। রূহুল

মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন—এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম (সা)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ? ইমাম মালিক এটা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর মতে এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ জানা নেই। কাজেই এর অর্থ خالق ও رازق এর ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোন নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি يا سين বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েয। কারণ, কোরআনে سَلَامٌ عَلَىٰ اٰلِ يَاسِيْنَ উল্লিখিত আছে।—(ইবনে আরাবী) এর প্রসিদ্ধ কিরা'ত اٰلِ يَاسِيْنَ -

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاءُ هُمْ—অর্থাৎ আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেন নি। পিতৃপুরুষ অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সাথে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবদের মধ্যে কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হন নি। তবে দীনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কোরআন পাকের এক আয়াতেও আছে। এছাড়া اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ আয়াত দৃষ্টেও জানা যায় যে, আল্লাহ্র রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াতও সতর্কীকরণ থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদ্সত্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই আয়াতে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। এরই ফল-স্বরূপ তাদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর একারণেই তাদের উপাধি ছিল 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর। لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ-اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا—الاية আল্লাহ্ তা'আলা কুফর ও ঈমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্য পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন। কিন্তু যে হতভাগা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে না, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে না, সে স্বেচ্ছায়

যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্য কুফরে উন্নতি লাভেরই ব্যবস্থা হতে থাকে। এ বিষয়টিই لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ লোকের জন্য তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কারণে এ উক্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

অতপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে---নিচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ এমন---যেন কারও চারদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাফিরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকারিতা অবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌঁছতেই পারে না।

ইমাম রাযী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'রকম হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপন সত্তাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাধা এমন যার ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফিরদের জন্য সত্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বর্ণিত হয়েছে। যার গলা নিচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণ শেষোক্ত বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে পায় না।---(রূহুল মা'আনী)

অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতকে তাদের কুফর ও হঠকারিতার উদাহরণ বলেই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ একে কোন কোন রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবূ জহল এবং আরও কতিপয় কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা অথবা উৎপীড়ন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চোখে আবরণ ফেলে দেন। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এমনি ধরনের একাধিক ঘটনা তফসীরের কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশই অগ্রাহ্য বিধায় তফসীরের ভিত্তি হতে পারে না।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ – অর্থাৎ আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে 'পূর্বাহ্নে প্রেরণ করা' বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো

এখানেই খতম হয়ে যায় না; বরং এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌঁছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম হলে জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ম হলে জাহান্নামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুলভ্রান্তির ও কমবেশি হওয়ার আশংকা না থাকে।

কর্মের মত তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয়ঃ وَاٰثَارَهُمْ—অর্থ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। اٰثَار এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে উদাহরণত কেউ মানুষকে দীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যদ্দ্বারা মানুষের দীনী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল—তার এই সৎকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়—কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানূন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء - ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لاينقص من اوزارهم شئا ثم تلا ونكتب ما قدموا واثارهم -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব—অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহ্ও তার আমলনামায় লিখিত হবে—অথচ পালনকারীদের গোনাহ্ হ্রাস করা হবে না।—(ইবনে কাসীর)

اٰثَار শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাযের জন্য মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়। কোন কোন

রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে اثار বলে এই পদাংকই বোঝানো হয়েছে। নামাযের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তোমাদের সওয়াবও তত বেশি হবে। ইবনে কাসীর এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একত্র করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উল্লিখিত ঘটনা মদীনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? জওয়াব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাংককেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়। —(ইবনে কাসীর)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ إِذْ
أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ
مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ
شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾
وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا
لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ
أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ
رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا
وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾
ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ ءَالِهَةً إِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ

شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ
بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۭ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾
بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰي قَوْمِهٖ
مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا
صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾ يٰحَسْرَةً عَلَي الْعِبَادِ ۚ مَا
يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا
قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ
لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾

(১৭) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতপর ওরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, রহমান আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। (১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদিগার জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রসূলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুত তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বৈ নও। (২০) অতপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত। (২২) আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর ইবাদত করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব?

করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কাছ থেকে শুনে নাও। (২৬) তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোনক্রমে জানতে পারত---(২৭) যে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন! (২৮) তারপরে আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। (২৯) বস্তুত এ ছিল এক মহানাদ। অতপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের জন্য আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিদ্রূপ করে না। (৩১) তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আপনি তাদের (কাফিরদের) কাছে (রিসালতের সমর্থন এবং তওহীদ ও রিসালত অস্বীকারের কারণে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে) এক জনপদের অধিবাসী-দের কাহিনী বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থাৎ) আমি (প্রথমে) তাদের কাছে দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতপর ওরা উভয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাঁদের উভয়কে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজন (রসূলের) মাধ্যমে। অতপর তাঁরা তিনজনই (জনপদবাসীদেরকে) বলল: আমরা তোমাদের কাছে-- (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) প্রেরিত হয়েছি (যাতে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস এবং মূর্তিপূজা পরিহার করার জন্য হিদায়ত করি। বলা বাহুল্য, তারা ছিল মূর্তিপূজক; যেমন ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً — আয়াত থেকে তা জানা যায়।) তারা (অর্থাৎ জনপদবাসীরা) বলল, তোমরা তো আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। (রসূল হওয়ার বৈশিষ্ট্য তোমাদের নেই।) আর (তোমাদের বৈশিষ্ট্যই বা কি থাকবে, রিসালত বিষয়টি ভিত্তিহীন।) রহমান আল্লাহ্ (তো কিতাব বা বিধান জাতীয়) কোন কিছু অবতীর্ণই করেনি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। রসূলগণ বললেন, আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে (রসূলরূপে) প্রেরিত হয়েছি। (বিভিন্ন প্রমাণ বর্ণনা করার পরও) যখন তারা মানেনি তখন শেষ জওয়াবরূপে বাধ্য হয়ে তাঁরা কসম খেয়েছেন। যেমন পরবর্তী স্বয়ং তাঁদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, (খোলাখুলি বিধান) প্রচার করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল। (প্রমাণাদি দ্বারা দাবি প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া যেহেতু

কোন বিষয় খোলাসা হয় না তাই বোঝা গেল যে, প্রথমে তারা প্রমাণাদি পেশ করেছিলেন এবং সবশেষে কসম করেছেন। মোটকথা, আমরা আমাদের কাজ করেছি। এখন তোমরা না মানলে আমরা কি করব।) তারা বলতে লাগল, আমরা তোমাদেরকে অলক্ষুণে মনে করি। (হয় তারা দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল বিধায় না হয় নতুন বিষয় প্রচারের ফলে তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও মতানৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কারণে একথা বলেছিল। তোমরা জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছ। যার ফলে অকল্যাণ হচ্ছে এবং এটাই অলক্ষণ। আর এর কারণ (তোমরা) যদি এ দাবি ও আহবান থেকে বিরত না হও, তবে (মনে রেখ) আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং (এর আগেও) আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। রসূলগণ বললেন, তোমাদের অমংগল তোমাদের সাথেই লেগে আছে। (অর্থাৎ অমংগলের কারণ হল সত্য গ্রহণ না করা। আর তা হল তোমাদেরই কাজ)। আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি; তোমরা কি তাকে অমঙ্গল বলে মনে কর? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অমঙ্গল নয়;) বরং তোমরা (স্বয়ং) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (সুতরাং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তোমাদের অমঙ্গল হয়েছে এ যুক্তি-বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণের দরুন তোমরা এর কারণ বুঝেছ। এই সংলাপের খবর প্রচারিত হলে) শহরের প্রান্ত থেকে এক (মুসলমান) ব্যক্তি (আপন সম্প্রদায়ের হিতাকাঙক্ষার কারণে অথবা রসূলগণের হিতাকাঙক্ষার কারণে) ছুটে আসল (এবং তাদেরকে) বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাঁদের, যাঁরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করেন না এবং তাঁরা স্বয়ং সুপথপ্রাপ্তও বটে (অর্থাৎ স্বার্থপরতা যা অনুসরণের পথে অন্তরায়বিশেষ তাও তাঁদের মাঝে অবর্তমান এবং সুপথে থাকা যা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে তা তাঁদের মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং এঁদের অনুসরণ করা হবে না কেন? এছাড়া (আমার এমন কি ওযর-আপত্তি রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন! (যা ইবাদতের যোগ্য হওয়ার প্রমাণ) তাঁর ইবাদত করব না (আর বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে আগন্তুক বলেছে এজন্য যাতে উদ্দিষ্টরা উত্তেজিত হয়ে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ না করে। আসল উদ্দেশ্য এই যে, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তোমাদের কি ওযর আছে?) তোমাদের সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (কাজেই তাঁর রসূলগণের অনুসরণ করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। অতপর বলা হয়েছে যে, মিথ্যা উপাস্যরা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।) আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য দেবদেবীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? (অথচ তারা এমন অসহায় যে,) করুণাময় (আল্লাহ্‌) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না এবং তারা আমাকে (শক্তির জোরে এই কষ্ট থেকে) রক্ষাও করতে পারবে না। অর্থাৎ না তারা নিজেরা ক্ষমতার অধিকারী এবং না ক্ষমতার অধিকারীর কাছে সুপারিশের মাধ্যমও হতে পারে। কারণ প্রথমত জড় পদার্থের মধ্যে সুপারিশের যোগ্যতাই নেই; দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না।) এমন করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হব। (এতেও বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে অপরকে

শুনানো হয়েছে)। আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব তোমরা (ও) আমার কথা শুন। (এবং বিশ্বাস স্থাপন কর। কিন্তু এসব কথায় তারা কর্ণপাত করল না।) বরং প্রস্তর বর্ষণ করে অথবা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে অথবা গলা টিপে তাকে শহীদ করল। শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। (তখনও সে আপন সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করল—) বলতে লাগল, হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানত আমার পালনকর্তা (ঈমান ও রসূলের অনুসরণের বরকতে) আমাকে ক্ষমা করেছেন। (এ অবস্থা জানলে তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সম্মানিত হতে পারত।) আর (জনপদবাসীরা যখন রসূলগণের সাথে এবং তাঁদের অনুসারীর সাথে এ আচরণ করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। বস্তুত) এ জন্য আমি তার (শহীদ ব্যক্তির) মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে (ফেরেশতাদের) কোন কাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। (কারণ তাদেরকে নিপাত করা এর উপর নির্ভরশীল ছিল না, যে জন্য কোন বিরাট বাহিনীর প্রয়োজন হতো বরং) সে শাস্তি ছিল এক বিকট আওয়াজ। [যা জিবরাঈল (আ) করেছিলেন অথবা অন্য কোন ফেরেশতা। صَيْحَةً বলে অন্য যে কোন আযাবও বুঝানো হয়ে থাকবে। যেমন, সূরা মু'মিনে فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে।] ফলে তারা তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। (অর্থাৎ মরে গেল। অতপর কাহিনীর পরিণতি বলার জন্য মিথ্যারোপকারীদের নিন্দা করা হয়েছে যে,) আক্ষেপ (এমন) বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে (এই মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি তারা তাদের মধ্যে (দুনিয়াতে আর) ফিরে আসে না। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তারা মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে বিরত থাকত। এ শাস্তি তো দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে আর পরকালে) তাদের সবাইকে সমবেতভাবে অবশ্যই আমার দরবারে উপস্থিত করা হবে। (সেখানে আবার শাস্তি হবে এবং সে শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ — কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ضرب مثل বলা হয়। পূর্বোল্লিখিত কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লিখিত জনপদ কোন্‌টি ? কোরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কাবে

আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবূ হাইয়ান ও ইবনে কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোন উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রখ্যাত ও বিরাট নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দুর্গ ও নগর-প্রাচীর দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খৃস্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুলজাররাহ্ (রা) এ শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর যিয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত জনপদ হচ্ছে এই ইন্তাকিয়া নগরী।

ইবনে কাসীর লেখেন, ইন্তাকিয়া ছিল খৃস্ট ধর্ম ও খৃস্টবাদের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত চারটি শহরের অন্যতম। এ চারটি শহর হচ্ছে কুদ্‌স্, রোমীয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও ইন্তাকিয়া। তিনি আরও লিখেছেন, খৃস্ট ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইন্তাকিয়া। এর ভিত্তিতেই, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি ইন্তাকিয়া কি না সে ব্যাপারে ইবনে কাসীর (র) দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। কেননা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল রিসালত অস্বীকারকারীদের বসতি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। অতএব খৃস্ট ধর্ম গ্রহণে অগ্রগামী ইন্তাকিয়া কেমন করে এই জনপদ হতে পারে!

এ ছাড়া কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনায় সমগ্র জনপদের উপর সর্বনাশা আযাব নেমে আসে, যার ফলে সেখানকার কেউ রক্ষা পায়নি। অথচ ইন্তাকিয়া সম্পর্কে ইতিহাসে এরূপ কোন ঘটনা বর্ণিত নেই। তাই ইবনে কাসীরের মতে হয় আয়াতে উল্লিখিত জনপদ ইন্তাকিয়া নয়, অন্য কোন বসতি, না হয় ইন্তাকিয়া নামেই অন্য কোন বসতি হবে যা প্রসিদ্ধ ইন্তাকিয়া শহর নয়।

ফতহুল মান্নানের গ্রন্থকার ইবনে কাসীরের এসব প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাই নির্ভেজাল বলে মনে হল। তিনি বলেন, আয়াতের বিষয় বোঝার জন্য এই জনপদ নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। কোরআন পাক যখন একে অস্পষ্ট রেখেছে, তখন জবরদস্তি একে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ববর্তী মনীষিগণও বলেন, أبهموا ما أبهم الله অর্থাৎ আল্লাহ্ যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও।

اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ — বর্ণিত জনপদে তিনজন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রসূল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় একজন রসূল প্রেরণ করলেন। অতপর রসূলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদবাসীদেরকে বললেন, اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ আমরা অবশ্যই তোমাদের হিদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

এখানে রসূলের অর্থ কি এবং এ রসূল কারা ছিলেন? রসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি কোরআন পাকে সাধারণত নবী ও পয়গম্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রসূল অর্থ নবী ও পয়গম্বর। ইবনে ইসহাক, হযরত ইবনে আব্বাস, কা'বে আহ্বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিনজনই আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদুক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে।---(ইবনে-কাসীর)

হযরত কাতাদাহ বলেন, এখানে مُرْسَلُوْن শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, বরং আভিধানিক 'দূত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেরিত তিনজন স্বয়ং পয়গম্বর ছিলেন না; বরং হযরত ঈসা (আ)-র সহচরগণের মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশে জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন।---(ইবনে কাসীর) প্রেরক ঈসা (আ) আল্লাহ্র রসূল ছিলেন বিধায় তাঁর প্রেরণও পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই প্রেরণ ছিল। তাই আয়াতে 'আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন' বলা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রথম উক্তি এবং কুরতুবী প্রমুখ দ্বিতীয় উক্তি গ্রহণ করেছেন। আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ্র নবী ও পয়গম্বর ছিলেন।

قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ — تطير শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোন কষ্ট-দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফিরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হিদায়তকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে। যেমন মূসা (আ)-র সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে আছে ঃ

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى

وَمَنْ مَّعَهٗ — এমনিভাবে সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল ঃ تَطَيَّرْنَا بِكَ

وَبِمَنْ مَّعَكَ — আলোচ্য ঘটনায়ও তাই হয়েছে।

قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ — অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুকর্মের ফল। طَائِر শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)

وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى — প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে قرية শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ ; তা—ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে مدينة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোন বড় শহরই ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইন্তাকিয়া বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত اقصى المدينة অর্থ এই যে, শহরের কোন একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। رجل يسعى—এতে يسعى শব্দটি سعى থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাঁড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। কোন কোন সময় سعى সযত্নে চলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, সূরা জুম'আয় فاسعوا الى ذكر الله বাক্যে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা ঃ কোরআন পাক তাঁর নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইস্‌হাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি 'নাজ্জার' অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত রসূলদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মু'জিয়া দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোন এক গুহায় ইবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন

সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও রসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেনঃ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ — অর্থাৎ আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম—তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং এতে "তোমাদের পালনকর্তা" বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং فَاسْمَعُونِ বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহ্‌র সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ — অর্থাৎ উপদেশদানের উদ্দেশ্যে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হল; জান্নাতে প্রবেশ কর। বাহ্যত কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেওয়া যে, জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ হাশর-নশরের পর তুমি তা লাভ করবে।—(কুরতুবী)

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান তখন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ কবর জগতেও জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েসের উপকরণ পৌঁছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌঁছা একদিক দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ করার শামিল।

কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাইল নাজ্জার নামক এ ব্যক্তি সেই ব্যক্তিত্রয়ের অন্যতম, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।—(বুখারী)

এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয়গম্বরের বেলায় এমন হয়নি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাজ্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ছিলেন। তাঁর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবি যে সত্য, তার কোন প্রমাণ বা নিদর্শন আছে কি? তাঁরা হ্যাঁ' বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রসূলগণ বললেন, হ্যাঁ; আমরা আমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেবদেবীদের কাছে দোয়া করছি; কিন্তু কোনই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদিগার একদিনে কিরূপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হ্যাঁ আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন গুরুত্বই নেই। তারা কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রসূলগণ তাঁর জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তাঁর ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রসূলগণের বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি رب اهد قومى (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে হিদায়ত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা রসূলত্রয়কেও শহীদ করে দেয়। কিন্তু কোন সহীহ্ রেওয়ায়েতে তাঁদের পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়নি। দৃশ্যত মনে হয় যে, তাঁরা নিহত হন নি। —(কুরতুবী)

يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ—

—হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায় আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত যে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নিয়ামত দান করেছেন, তবে সম্ভবত তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও সংস্কার ঃ প্রেরিত রসূলত্রয় মুশরিক ও কাফিরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জওয়াব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্য চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে।

রসূলগণের উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরিকরা তিনটি কথা বলেছে ঃ

(১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?

(২) করুণাময় আল্লাহ্ কারও প্রতি কোন পয়গাম ও কিতাব নাযিল করেন নি।

(৩) তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ।

চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন। তাঁরা শুধু বললেন رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ – অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরও বললেন ঃ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ – অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহ্র পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উষ্কানিমূলক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্নেহপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন।

এরপর মুশরিকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নির্দিষ্ট জওয়াব ছিল এই ঃ অলক্ষুণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিষ্কার হয়নি। তাঁরা বললেন, طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ – অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে। অতপর আবার স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন, أَئِن ذُكِّرْتُم – অর্থাৎ তোমরা চিন্তা কর আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হ্যাঁ, তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এই ঃ

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ- অর্থাৎ তোমরাই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নও-মুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে দু'টি কথা বলে সম্প্রদায়কে রসূলগণের কথা মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূরদূরান্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোনরকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও হিদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নির্মিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখে না এবং আল্লাহ্‌র কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে।

কিন্তু হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন।

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي— অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্য উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে رَبِّ اهْدِ قَوْمِي বলতে বলতে আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, সম্প্রদায়ের নির্যাতনে শহীদ হাবীব নাজ্জার যখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, সম্মান ও জান্নাতের নিয়ামত প্রত্যক্ষ করলেন, তখনও পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে শুভেচ্ছা ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, হায়! আমার সম্প্রদায় আমার এই সম্মান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলে তারাও এতে আমার প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের অংশীদার হয়ে যেত। সোবহানাল্লাহ্, মানুষের অত্যাচার-উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা এ ধরনের মহাপুরুষদের শিরা-উপশিরায় কিভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে। পরোপকারের এই মহান প্রেরণার ফলেই জাতিসমূহের কায়া পাল্টে যায় এবং তারা এমন মর্যাদার আসন লাভ করে, যা ফেরেশতাদের জন্যও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকগণ সাধারণভাবে এই পয়গম্বরসুলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার নিষ্ফল হয়ে যায়। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ঝাল মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরী জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশি জেদ ও হঠ-কারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ — এতে মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নাজ্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর আসমানী আযাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আযাব দেওয়ার জন্য আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়। কারণ আল্লাহ্‌র একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্প্রদায়কে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্য ফেরেশতার বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন! এরপর তাদের উপর আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল আমীন ফেরেশতা শহরের দরজার দুই বাহু ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কোরআন خَامِدُونَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। خامد এর অর্থ আগুনের নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু। কাজেই خامدون অর্থ হল সহজাত তাপ খতম হওয়ার কারণে তারা ছিল শীতল ও নিথর।

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا

هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾
لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ
فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ
فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

(৩৩) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (৩৪) আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। (৩৫) যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (৩৬) পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানেনা, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (৩৮) সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ। (৩৯) চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৪০) সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৪১) তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (৪২) এবং তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহণ সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। (৪৪) কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেওয়ার কারণে তা করি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদের নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী (এতে নিদর্শনের বিষয় এই যে,) আমি একে (বৃষ্টির দ্বারা) সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে (বিভিন্ন) শস্য উৎপন্ন করি। তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে

সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং (বাগানে জল সেচের জন্য) তাতে প্রবাহিত করি নির্ঝরিণী, যাতে (শস্যের ন্যায়) তারা তার (অর্থাৎ, বাগানের) ফলমূল খায়। একে (অর্থাৎ, ফল ও শস্যকে) তাদের হাত সৃষ্টি করে না। (বীজ বপন ও জল সেচন বাহ্যত তাদের হাতে হলেও বীজ থেকে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ থেকে ফল উদ্‌গত করার মধ্যে তাদের কোন হাত নেই। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।) অতপর (এমন প্রমাণাদি দেখেও) তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (কৃতজ্ঞতার প্রথম ধাপ হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব স্বীকার করে নেওয়া।) পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন; (উদ্ভিদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী জোড়া যেমন গম-যব, মিষ্ট ফল ও টক ফল, মানুষের মধ্যে যেমন নর ও নারী এবং অজানা বস্তুসমূহের মধ্যেও কোন বস্তু বিপরীত জোড়া থেকে মুক্ত নয়। এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিপরীত নেই।) তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি। (অন্ধকার আসল বিধায় রাত্রিই আসল সময় ছিল। সূর্যের আলো এসে একে আবৃত করে নিয়েছিল; যেমন ছাগলের গোশ্‌তকে তার চামড়া আবৃত করে নেয়।) অতপর আমি (সূর্যের আলো দূর করে যেন) তা থেকে (অর্থাৎ রাত্রি থেকে) দিনকে অপসারিত করি। তখনই (আবার রাত্রি এসে যায় এবং) তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (আরও একটি নিদর্শন) সূর্য (সে) তার অবস্থানের দিকে আবর্তন করে। (এখানে অবস্থানের এক অর্থ সেই কেন্দ্রবিন্দু, যেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বার্ষিক গতি পূর্ণ করে আবার সেখানে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় অর্থ সেই দিগন্তস্থিত বিন্দু, দৈনিক গতি পূর্ণ করে যেখানে পৌঁছে অস্ত যায়।) এটা সেই আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট, যিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ, শক্তিমান) সর্বজ্ঞ (এসব ব্যবস্থাপনার রহস্য ও উপযোগিতা জানেন এবং শক্তি বলে এগুলো প্রয়োগ করেন। আরও এক নিদর্শন) চন্দ্র, তার (চলার) জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। (সে প্রত্যহ এক মনযিল অতিক্রম করে) অবশেষে (চিকন হতে হতে) পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়, (যা সরু ও বাঁকা হয়ে থাকে। নিস্তেজ আলোর কারণে হলুদ বর্ণের সাথেও তুলনা হতে পারে। সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তন এবং রাত্রি ও দিনের আগমন নির্গমন এমন সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হয়েছে যে,) সূর্যের সাধ্য নেই যে, চন্দ্রের (আলোদানের সময় অর্থাৎ রাত্রিতে তার) নাগাল পায়। (অর্থাৎ সূর্য সময়ের আগেই উদিত হয়ে চন্দ্রকে এবং তার সময় অর্থাৎ, রাত্রিকে সরিয়ে দিন করতে পারে না। এমনিভাবে চন্দ্র ও সূর্যের আলো দানের সময় তার নাগাল পায় না। এমনিভাবে) রাত্রি দিনের অগ্রে চলতে পারে না। (অর্থাৎ দিনের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বে রাত্রি আসতে পারে না, যেমন দিনও তা পারে না।) প্রত্যেকেই (অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র) আপন আপন কক্ষপথে (এমনভাবে চলছে যেন) সন্তরণ করে। তারা হিসাবের বাইরে যেতে পারে না, গেলে দিবা-রাত্রির হিসাব ত্রুটিযুক্ত হয়ে যেত।) তাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (অধিকাংশ মানুষ তাদের সন্তান-সন্ততিকে বাণিজ্য ব্যপদেশে সফরে প্রেরণ করত।

সুতরাং এতে তিনটি নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত হয়েছে---এক, বোঝাই নৌকাকে পানির উপর চলমান করা, অথচ ভারী হওয়ার কারণে এর ডুবে যাওয়া উচিত ছিল। দুই, তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করা। তিন, রিযিক ও তার উপকরণ দেওয়া। ফলে তারা নিজেরা গৃহে বসে থাকে এবং সন্তানসন্ততিকে রিযিক সংগ্রহে প্রেরণ করে।) এবং (স্থলভাগে সফরের জন্য) আমি তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যেগুলোতে তারা আরোহণ করে। (অর্থাৎ, উট ইত্যাদি। নৌকার সাথে তুলনা এদিক দিয়ে যে, এগুলোতেও আরোহণ ও মাল পরিবহন করা যায় এবং দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। আরবদেশে উটকে سفينة البر অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলা হত। এর ফলে তুলনাটি আরও অলংকারপূর্ণ হয়েছে। অতপর নৌকার সাথে মিল রেখে কাফিরদের জন্য একটি শাস্তিবাণী উল্লেখ করা হয়েছে ঃ) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি। তখন (তাদের উপাস্যদের মধ্য থেকে) তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (যে তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে) এবং তারা (নিমজ্জিত হওয়ার পর মৃত্যু থেকে) পরিত্রাণও পাবে না। কিন্তু আমারই কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল (পার্থিব জীবন) ভোগ করার সুযোগ দান করার কারণে (অবকাশ দিয়ে রেখেছি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমনি ধরনের নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল প্রকাশ পায়। অতপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্য ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ—অর্থাৎ বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্য সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই ঃ বলা হয়েছে وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব ফল তৈরি করেনি। এ বাক্যটি অনবধান মানুষকে আহবান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কি যে তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ করা---এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য। সূরা ওয়াকেয়ার এ আয়াতটি এরই অনুরূপ, أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ অর্থাৎ তোমরা যা বপন কর, তাকে সমৃদ্ধ করে বৃক্ষে পরিণত করার কাজটি তোমরা কর, না আমি করি? সারকথা এই যে, এসব ফলমূল তৈরিতে মানুষের কোন হাত না থাকলেও আমি এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তৎসঙ্গে এগুলো ভক্ষণ করার ও কাজে লাগাবার নৈপুণ্যও শিক্ষা দিয়েছি।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে ঃ ইবনে জরীর প্রমুখ তফসীরবিদ وَمَا عَمِلَتْهُ বাক্যের ما-কে موصول -এর অর্থে ধরে অনুবাদ করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফলমূল ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফলমূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরি করে। উদাহরণত ফলমূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কতক ফল থেকে তৈল বের করা হয়। সারকথা এই যে, ফলমূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার যোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরি করার নৈপুণ্যও আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে হরেক রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত। এই তফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত ইবনে মসউদের এক কেরাত দ্বারাও এই তফসীরটি সমর্থিত হয়। তাঁর কেরাতে ما শব্দের পরিবর্তে مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ রয়েছে।

এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ও ফল ভক্ষণ করে। কতক জানোয়ার মাংস এবং কতক জানোয়ার মাটি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাদের খোরাক একক বস্তুই হয়ে থাকে। তৃণভোজী জন্তু খাঁটি তৃণ এবং মাংসভোজী জন্তু খাঁটি মাংস ভক্ষণ করে। কয়েক প্রকারের বস্তুকে একত্রে মিলিয়ে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত করা লবণ, মরিচ, চিনি, টক ইত্যাদি মিশ্রিত করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি করা---এক প্রকার মিশ্র খোরাক একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্য তৈরি করার নৈপুণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এসব নিয়ামত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে أَفَلَا يَشْكُرُونَ—বুদ্ধিমানরা এসব বস্তু দেখার পরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা কেন? অতপর মানুষ ও জীবজন্তুকে শামিল করে সর্বময় ক্ষমতার আরও একটি নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

এতে أزواج শব্দটি زوج -এর বহুবচন। অর্থ জোড়া। জোড়ার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দুই বস্তু থাকে, যেমন নর ও নারীর মধ্যে নরকে নারীর এবং নারীকে নরের জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজন্তুর নর ও মাদা পরস্পরে জোড়া। অনেক উদ্ভিদের মধ্যেও নর ও মাদার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খেজুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে তো এটা সুবিদিতই। অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এটা অবান্তর নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, সমস্ত ফলবিশিষ্ট ও ফুলবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে নর ও মাদা হয়ে থাকে এবং এগুলোতে প্রজনন প্রক্রিয়াও চালু আছে। এমনি ধরনের গোপন প্রক্রিয়া যদি জড়পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তফসীরবিদগণ أزواج শব্দের অর্থ নিয়েছেন প্রকার ও শ্রেণী। কেননা, দু'টি বিপরীত বস্তুকেও জোড়া বলা হয়; যেমন শৈত্য—উত্তাপ, জল-স্থল, দুঃখ-আনন্দ, রোগ-সুস্থতা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝারি হওয়ার দিক দিয়ে অনেক স্তর ও শ্রেণী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বর্ণ, আকার, ভাষা ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেক শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে। أزواج শব্দের মধ্যে এগুলো সব দাখিল আছে। আয়াতের প্রথমে مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ বলে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর مِنْ أَنْفُسِهِمْ বলে মানুষের